৬ষ্ঠ সংখ্যা

# সুশাসন বার্তা

(Good Governance Newsletter)

ই.ইউ. লোকাল গভার্নেন্স প্রকল্পের নিউজলেটার

জুলাই ২০১২

## সম্পাদকীয়

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ইউনিয়ন পরিষদ অতি পুরনো এবং জনগণের সবচেয়ে কাছের প্রতিষ্ঠান। প্রায় কয়েক শত বছরের প্রাচীনতম এই প্রতিষ্ঠানটি একটি ধারাবাহিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান রূপ লাভ করেছে। যেমন, প্রাক বৃটিশ আমলে একে বলা হতো সভা, পঞ্চায়েত, ১৮৭০ সালে চৌকিদারি পঞ্চায়েত, ১৮৮৫ সালে ইউনিয়ন কমিটি, ১৯১৯ সালে ইউনিয়ন বোর্ড, পাকিস্তান আমলে (১৯৫৯ সালে) ইউনিয়ন কাউন্সিল এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের পর এই প্রতিষ্ঠানটির নাম হয় ইউনিয়ন পরিষদ।

কম সময়ে, কম খরচে ও কম পরিশ্রমে গ্রামীণ পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি এবং বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে স্থানীয় জনগণের চাহিদা মোতাবেক স্থানীয় উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ রাখতে পারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। কেয়ার বাংলাদেশ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় স্থানীয় সহযোগী সংগঠন এসকেএস ফাউন্ডেশন এবং স্যাপ বাংলাদেশ এর সাথে যৌথভাবে ২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গাইবান্ধা ও লালমণিরহাট জেলার ৩৫টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করছে "স্থানীয় শাসন প্রকল্প (Local Governance Project)"। এই প্রকল্প ইউনিয়ন পরিষদের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে। এই প্রকল্পের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য স্থানীয় উন্নয়নে জনগণের, বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া নারী, আদিবাসী ও হতদরিদ্র মানুষের অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি। এই প্রকল্পের কাজের ফলে স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন চর্চার (governance practice) মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আশা করা যায়।

ইউনিয়ন পর্যায়ে সুশাসন চর্চা শুধু দু/একটি কর্মসূচি বা 'event'-এ সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, এটা হতে হবে চলমান। বছরব্যাপী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ভালো কাজগুলোকে (good practice) "নিয়মিত চর্চা/অভ্যাসে (regular practice)" নিয়ে আসতে হবে। যেমন; স্থানীয় জনগণ, বিশেষ করে দরিদ্র ও হতদরিদ্র নারী-পুরুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে "ওয়ার্ড ভিত্তিক" পরিকল্পনা তৈরি এবং সে অনুযায়ী প্রতিটি ওয়ার্ডের খসড়া বাজেট তৈরি। এভাবে ৯টি ওয়ার্ডের পরিকল্পনার আলোকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ইউনিয়নের বাজেট তৈরি করা। প্রতি তিন মাস পর পর ওয়ার্ড পর্যায়ে স্থানীয় জনগণ এবং ওয়ার্ড মেম্বারের উপস্থিতিতে "বাজেট পর্যালোচনা" সভা করা, যেখানে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হবে। কোনো কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি পরিকল্পনা অনুযায়ী না হলে ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা নিয়েও এই সভায় আলোচনা করা। প্রয়োজনে পুঃন পরিকল্পনা করা। নিয়মিত ইউনিয়ন পরিষদের মাসিক সভা ও স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলোর সভা করা। স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। ইউনিয়ন পর্যায়ে "সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় সভা" নিয়মিত করার মাধ্যমে স্থানীয় সম্পদে ও সেবায় হতদরিদ্র ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিত করা। প্রতি ছয়মাস অন্তর স্থানীয় জনগণ, গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে ইউনিয়ন পরিষদের স্ব-মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা। ইউনিয়ন পরিষদ নিজেদের মূল্যায়ন নিজেরাই করবে। আবার স্থানীয় জনগণও নিজ নিজ ওয়ার্ডের ইউপি মেম্বারকে মূল্যায়ন করতে পারে। এই প্রক্রিয়ার ফলে যে সকল ইউপি সদস্য/সদস্যা ভালো কাজ করছেন বলে প্রতীয়মান হবে, তারা ভবিষ্যতে আরও ভালো কাজ করার জন্য উৎসাহ পাবেন। পাশাপাশি, যে সকল সদস্য/ সদস্যা তুলনামূলক ভালো করতে পারেননি, তারা নিজেদের কাজের উৎকর্ষ সাধনে সচেষ্ট হবেন। এছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদ বিভিন্ন ধরনের দারিদ্র্য দূরীকরণ মূলক ও নারীবান্ধব প্রকল্প গ্রহণ করবে। এর ফলে দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে। ইউপির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো "তথ্যকেন্দ্র" বছরব্যাপী চালু রেখে ইউনিয়নের সকল স্তরের জনগণের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা। "সামাজিক নিরাপত্তা জাল/বেষ্টনী কর্মসূচি (Social Safety-net Program)" সঠিকভাবে সঠিক লোকের কাছে যেন পৌঁছে, সে ব্যবস্থা বিদ্যমান রাখা। স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসনকে স্থায়ীরূপ দিতে স্থানীয় জনগণেরও কিছু ভূমিকা আছে। তাদেরকে হোল্ডিং ট্যাক্সসহ অন্যান্য ট্যাক্স নিয়মিতভাবে পরিশোধ করে ইউনিয়ন পরিষদের হাতকে শক্তিশালী করতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে এবং জনকেন্দ্রিক কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে সহায়তা করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায় সকল স্তরের জনগণ, তৃণমূল সংগঠন, বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদ, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি প্রশাসনসহ সকল মহলের সম্মিলিত প্রয়াসই স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন চর্চাকে (governance practice) প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

আ,ন,ম কায়সার জিলানী, টিম লিডার
স্থানীয় শাসন প্রকল্প, কেয়ার বাংলাদেশ

## মহুলিপাড়াবাসী নিজেদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে চান

গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার সাপমারা ইউনিয়নে আদিবাসী সম্প্রদায়ের বাস সেই আদিকাল থেকেই। এ অঞ্চলে একাধিক আদিবাসী সম্প্রদায়ের বসবাস। এদের মধ্যে একটি হলো 'মহুলি' সম্প্রদায়। মহুলিদের আদি পেশা বাঁশ ও বেতের উপকরণ তৈরি করে তা বিক্রি করা। পূর্বে তাদের আবাদি জমি থাকলেও এখন তাদের বাস্তুভিটা ছাড়া আর অন্য কোনো সম্পদ নেই।

পুঁজির অভাবে বাঁশ ও বেত কিনতে না পারায় তারা ভিন্ন পেশায় জড়িয়ে পড়েছে। কেউ বা সপরিবার অন্যের জমিতে শ্রম বিক্রি করে, কেউ বা গ্রামে গ্রামে ঘুরে গৃহস্থালী কাজ করে সংসার চালায়। সে কাজও বছরের সব সময় থাকে না। তখন তাদের মানবেতর জীবনযাপন করতে হয়। আদিবাসী সংখ্যালঘু হিসেবে সামাজিক অবহেলা ও নির্যাতনের শিকার হতে হয় হরহামেশাই। স্থানীয় সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক ন্যায় বিচার থেকে তারা বঞ্চিত।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আর্থিক সহযোগিতায় এবং কেয়ার বাংলাদেশ-এর সহযোগিতায় স্যাপ-বাংলাদেশ ও এসকেএস ফাউন্ডেশন স্থানীয় শাসন প্রকল্পের আওতায় সাপমারা ইউনিয়ন পরিষদ ও ইউনিয়নের বিভিন্ন আদিবাসী পাড়ায় ২০০৯ সালে কাজ শুরু করে। মহুলিপাড়ার দরিদ্র ও হতদরিদ্র আদিবাসীরা সামাজিক বিশ্লেষণ, স্ব-মূল্যায়ন করার মধ্য দিয়ে নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এবং স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে সংগঠন গড়ে তুলেছেন এবং কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেন। তারা প্রকল্পের কর্মীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। তারা বিশ্বাস করেন যে, স্থানীয় শাসন প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের জীবনে কিছুটা হলেও ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের ফলে কয়েকজন স্বভাবনেতা গড়ে উঠেছেন। তারা এখন নিজেদের পাড়ার উন্নয়নে নেতৃত্ব দেয়া ছাড়াও ইউনিয়ন স্বভাবনেতা সংগঠনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে মহুলিপাড়ার আদিবাসীরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে জানতে পারছেন এবং অধিকার আদায়ে উদ্যোগ নিচ্ছেন।

মহুলি পাড়ার ১৮টি পরিবার প্রত্যেকে প্রকল্পের পক্ষ থেকে কুটির শিল্প কাজের জন্য ৩০০০/= (তিন হাজার) টাকা করে মোট ৫৪০০০/= (চুয়ান্ন হাজার) টাকা অনুদান পেয়েছে। এর মধ্যে নগদ টাকা ২২০০/= (দুই হাজার দুইশত) এবং ৮০০/= (আটশত) টাকার বাঁশ পেয়েছেন। সে টাকা ও বাঁশ দিয়ে তারা বাঁশ-বেতের কাজ করছেন। তৈরি করছেন বাঁশ ও বেতের উপকরণ। আর সেসব উপকরণ বাজারে বিক্রি করে তারা তাদের সাংসারিক ব্যয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মেটাচ্ছেন। তারা নিজেদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের সাথে যোগাযোগ বাড়িয়েছেন। ইতিমধ্যে ইউনিয়ন পরিষদের স্ট্যান্ডিং কমিটিতে সদস্য হিসেবে মহুলি পাড়ার কয়েকজন অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। ইউনিয়ন পরিষদের কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতেও তাদের কয়েকজন ভূমিকা রাখছেন। সরকারি ও বেসরকারি সেবাদানকারী সংস্থার সাথে তাদের যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। পাড়ার কয়েকজন সদস্য স্থানীয় শাসন প্রকল্পের আওতায় জেন্ডার বিশ্লেষণ প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ইউনিয়ন পরিষদের সাথে নারীর অধিকার নিয়ে আলোচনা করছেন। ফলে, ইউনিয়ন স্বভাবনেতা সংগঠন, সিবিও এবং আশপাশের পাড়া/কমিউনিটি সংগঠনের সাথে মহুলি পাড়ার আদিবাসীদের সংহতি জোরদার হচ্ছে।

অ্যামিলিয়া মার্ডির পরিবার মহুলিপাড়ার ১৮টি আদিবাসী পরিবারের মধ্যে একটি। বসতভিটার মাত্র ৩ শতাংশ জমি ছাড়া তাদের আর কোনো জমি-জমা নেই। পাশাপাশি, কাজ জানা সত্ত্বেও তারা পুঁজির অভাবে বাঁশ-বেতের কাজ করতে পারছিলেন না। জীবন বাঁচানোর তাগিদে আদি পেশা ত্যাগ করে স্বামী-সন্তান নিয়ে অন্যের জমিতে শ্রম বিক্রি করতেন। অনেক কষ্টে সংসার চালাতে হতো। কাজের অভাবে বছরের বেশিরভাগ সময়েই অলস বসে থাকতে হতো। অভাবের তাড়নায় তার ছেলেটি পরিবার থেকে আলাদা হয়ে যায়। মেয়ে স্থানীয় স্কুলে পড়ালেখা করতো। কিন্তু অর্থের অভাবে তার পড়ালেখাও বন্ধ হয়ে যায়। অথচ অনেক স্বপ্ন, আশা নিয়ে মেয়েকে লেখাপড়া করাতে চেয়েছিলেন অ্যামিলিয়া মার্ডি। কারণ তার চৌদ্দ পুরুষের মধ্যে কোনো লেখাপড়া জানা লোক নেই। তাই তার স্বপ্ন ছিলো মেয়ে শিক্ষিত হবে, মানুষের মতো মানুষ হবে, লেখাপড়া শেষ করে চাকুরি করবে। আর মেয়ের উপার্জনের টাকা দিয়ে পরিবারের সকলে মিলে তিনবেলা খেতে পারবে। ভালো জামা-কাপড় পরতে পারবে। এবং এভাবেই একদিন তাদের সংসারের দুঃখ-দুর্দশা দূর হবে। এমনি অনেক স্বপ্ন নিয়ে তিনি মেয়েকে পড়তে দিয়েছিলেন।

এই সময়ে অ্যামিলিয়া মার্ডিও পাড়ার অন্য ১৭টি পরিবারের মতো প্রকল্পের পক্ষ থেকে ২ হাজার ২ শত টাকা আর্থিক অনুদান গ্রহণ করেন। এই অনুদানের টাকা দিয়ে তার পরিবার ডালি, কুলা চাঁটাই, চালনা, মাতম, খলই, ডুলি ইত্যাদি বাঁশের উপকরণ তৈরি করে তা বাজারে বিক্রি করা শুরু করেন। সেইসাথে কৃষি কাজও অব্যাহত রেখেছেন। এতে ধীরে ধীরে সংসারে সচ্ছলতা ফিরে আসছে। মেয়েকে (শ্যালমী হ্যামরন) পুনরায় স্কুলে ভর্তি করেছেন। অ্যামিলিয়া মার্ডি বাঁশ ও বেতের উপকরণ বিক্রির টাকা দিয়ে অল্প অল্প সঞ্চয় করে মেয়ের এসএসসি পরিক্ষার ফরম পূরণের টাকা দিয়েছেন। তার

মেয়ে এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে বি গ্রেড (২.৯৬) পেয়ে পাশ করেছে। এতে তার পরিবার ও পাড়াবাসী মহা আনন্দিত। মেয়ের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হবার পর আবার স্কুলে পড়তে পারবে। এসএসসি পরীক্ষা দিতে পারবে এটা তিনি ভাবতে পারেননি। অ্যামিলিয়া মার্ডি ও তার পরিবার ভীষণ আশাবাদি তাদের স্বপ্ন একদিন বাস্তবে রূপ নেবে। তাদের মেয়ে উচ্চ শিক্ষিত হবে। পরিবারের হাল ধরবে।

অ্যামিলিয়া মার্ডির মতো মহুলিপাড়ার অন্যান্য আদিবাসী পরিবারগুলোও সচ্ছল হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। নিজেদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে চাচ্ছেন।

**মোঃ আবু জুয়েল,** ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটর
স্থানীয় শাসন প্রকল্প, স্যাপ বাংলাদেশ
এবং
**এম. শফিউল্লাহ,** প্রজেক্ট অফিসার
স্থানীয় শাসন প্রকল্প, স্যাপ বাংলাদেশ

## জেন্ডার বিশ্লেষণ প্রশিক্ষণ গ্রাম আদালতের বিচারকাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে

কেয়ার বাংলাদেশ-এর সহযোগিতায় পরিচালিত স্থানীয় শাসন প্রকল্প আয়োজিত জেন্ডার বিশ্লেষণ প্রশিক্ষণ গ্রাম আদালতের বিচারকাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। গ্রাম আদালতের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিচারক তথা ইউপি চেয়ারম্যানরা জেন্ডার বিশ্লেষণ প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, তা এলাকার ছোটখাটো বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে উপকৃত হচ্ছেন। উপকৃত হচ্ছেন এলাকার মানুষও। এমনই একটি বিচারকাজে সফলতা এসেছে গাইবান্ধা জেলার স্থানীয় শাসন প্রকল্পের কর্ম এলাকায় লাকী বেগম ও আবু হোসেনের দ্বন্দ্ব নিরসনের ক্ষেত্রে।

গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার মুক্তিনগর ইউনিয়নের ধনরুহা গ্রামের লাকী বেগম। বয়স ২২ বছর। ১৭ বছর বয়সে তার বিয়ে হয় পার্শ্ববর্তী বৈলতেল গ্রামের একজন ব্যবসায়ী আবু হোসেনের সাথে। লাকীর বাবা মেয়ের সুখের কথা চিন্তা করে বিয়ের সময় আবু হোসেনকে ৫০ হাজার টাকা যৌতুক দেন। বিয়ের পর পর মোটামুটি সুখেই দিন কেটে যাচ্ছিলো লাকীর। কিন্তু কয়েক মাস না যেতেই আবুর আসল রূপ বেরিয়ে আসে। আবু হোসেন আরো যৌতুকের আশায় লাকীর উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শুরু করে। পাশাপাশি, সংসারে লাকীর মতামতের কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় না। সংসারের কোনো কাজে লাকীকে সহায়তাও করে না লাকীর স্বামী আবু হোসেন।

এভাবে কেটে যায় একটি বছর। লাকীর কোল জুড়ে আসে একটি পুত্র সন্তান। সন্তান হওয়ার পরে লাকীর প্রতি স্বামী আবু হোসেনের অবহেলা যেন আরো বেড়ে যায়। ছেলের দেখভাল করার সমস্ত দায়-দায়িত্ব যেন লাকীর একার। লাকীর স্বামী তার নিজের ব্যবসা ছাড়া সংসারের কোনো কাজে সহযোগিতা করা বন্ধ করে দেন। এমনি করে অবহেলায় দিন যেন আর কাটে না লাকীর। স্বামীর অবহেলাকে মেনে নিতে পারছিলেন না তিনি। স্বামীকে বোঝাতে চেষ্টা করে বার বার ব্যর্থ হন লাকী। এভাবে সংসারে অশান্তি ক্রমেই বাড়তে থাকে। পাশাপাশি, বেড়ে যায় লাকীর ওপর আবুর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। অবশেষে কোলের শিশুসহ লাকীকে বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দেন আবু হোসেন। তারপর থেকে লাকী ও তার সন্তানের ভরণপোষণ দেওয়া থেকে বিরত থাকেন আবু। এভাবেই কেটে যায় প্রায় বছরখানেক। বাবার সংসারে অমানবিক কষ্টে দিন কাটতে থাকে লাকী বেগমের।

একদিন এক আত্মীয়ের মাধ্যমে লাকীর পরিচয় হয় মুক্তিনগর ইউনিয়নের স্থানীয় শাসন প্রকল্পের স্বেচ্ছাসেবী নাসরিন আক্তার জেলীর সাথে। লাকী তার কাছ থেকে জানতে পারেন গ্রাম আদালতের বিচারকাজে স্বচ্ছতার কথা। এরপর স্বেচ্ছাসেবী জেলীর সহযোগিতায় লাকী ২০১২ সালের মার্চ মাসে মুক্তিনগর ইউনিয়নের গ্রাম আদালতে তার স্বামী আবু হোসেনের বিরুদ্ধে ভরণপোষণের মামলা করেন। মামলা করার ফলে আবু হোসেন আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। বিভিন্নভাবে হুমকি দিতে থাকেন লাকীকে। অবশ্য মামলা করার ফলে এক পর্যায়ে গ্রাম আদালতে হাজিরা দিতে বাধ্য হন আবু। গ্রাম আদালতে অনেক যুক্তিতর্কের পর আবু হোসেন মোহরানার ৭০ হাজার টাকা পরিশোধ করে লাকীকে তালাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু গ্রাম আদালতের বিচারকের দায়িত্ব পালনকারী ইউপি চেয়ারম্যান আবু হোসেনকে সমঝোতার মাধ্যমে বৈবাহিক বন্ধন অটুট রাখার প্রতি জোর দেন। তিনি আবু হোসেনকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, নারীর প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও নারী ও পুরুষের সমঅংশগ্রহণের ফলে সংসার জীবনে শান্তি আসবে এবং সমঅধিকার নিশ্চিত হবে। এতে লাকীর স্বামীর মনে পরিবর্তন আসে। আবু হোসেন তার নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং গ্রাম আদালতে ক্ষমা চান। তার চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন আনার জন্য তিনি চেয়ারম্যানের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ইউপি চেয়ারম্যান তার অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন,"*গ্রাম আদালতে এই মামলার বিচার কাজ পরিচালনা করতে গিয়ে আমি স্থানীয় শাসন প্রকল্পের আওতায় গ্রহণকৃত জেন্ডার বিশ্লেষণ প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছি। আমার এই জ্ঞান আবু হোসেনকে তাদের বৈবাহিক বন্ধন অটুট রাখতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং আবু হোসেনের মাঝে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে।*" তিনি আরো যোগ করেন,"*স্থানীয় শাসন প্রকল্পের সহায়তায় গ্রাম আদালত এখন অনেক সক্রিয় হয়ে উঠেছে*"।

উল্লেখ্য, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে কেয়ার বাংলাদেশ-এর সহায়তায় স্যাপ-বাংলাদেশ এবং এসকেএস ফাউন্ডেশন গাইবান্ধা ও

লালমণিরহাট জেলার ৩৫ টি ইউনিয়নে ২০০৯ সালে স্থানীয় শাসন প্রকল্পের কাজ শুরু করে। প্রকল্পটি কাজ শুরু করার পর থেকে স্বচ্ছতার সাথে গ্রাম আদালত পরিচালনা করায় স্বল্প সময়ে হতদরিদ্র, দরিদ্র ও সাধারণ মানুষের সুবিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত হচ্ছে। এতে কমিউনিটি ও ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে সম্পর্কেরও উন্নয়ন ঘটছে।

গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার মুক্তিনগর ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় শাসন প্রকল্পের আওতাভুক্ত একটি ইউনিয়ন। পূর্বে এই ইউনিয়ন পরিষদের বিচার ব্যবস্থা ছিলো খুবই দুর্বল। এই বিচার ব্যবস্থা ছিলো প্রভাবশালী ব্যক্তিদের হাতে জিম্মি। দরিদ্র-হতদরিদ্র মানুষ ন্যায় বিচার পেতো না। গ্রামের সাধারণ জনগণ সুবিচার পাওয়াতো দূরের কথা, তাদের দুর্ভোগ আরো বেড়ে যেতো। গত কয়েক বছরে প্রকল্পের পক্ষ থেকে ইউনিয়ন পরিষদের দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি তাদের আত্ম-উপলব্ধি সৃষ্টিতে সহায়তা করা হয়েছে। এই সময়ে ইউপির সদস্যদেরকে তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য, দারিদ্র্য বিশ্লেষণ এবং মনিটরিং, জেন্ডার বিশ্লেষণ, অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান এবং ইস্যুভিত্তিক আলোচনা অব্যাহত রাখা হয়েছে। এর ফলে এই ইউনিয়নের শাসন ব্যবস্থাসহ সার্বিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটছে।

মোঃ শামীম আহম্মেদ, ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটর
স্থানীয় শাসন প্রকল্প, স্যাপ বাংলাদেশ

## নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইউপি সদস্য আঞ্জুয়ারা

আঞ্জুয়ারা বেগম, স্বামী রিপন সরকার, গ্রাম : শালমারা, পো : ভেলাবাড়ী, উপজেলা : আদিতমারী, জেলা : লালমণিরহাট। মাত্র ১২ বছর বয়সে তার বিয়ে হয়। তখন তিনি সবে ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। বাল্যবিবাহের কারণে শুরু হয় তার কষ্টের জীবন। স্বামী বেকার। কোনো প্রকার আয় রোজগার ছিলো না। তাই তাদের সংসারে অভাবের অন্ত নাই। চারিদিকে শুধু হতাশা আর হাহাকার। আঞ্জুয়ারার বাবার বাড়ির অবস্থাও ছিলো অভাবগ্রস্ত। নিজের বলতে সম্বল ছিলো শুধু সামান্য লেখাপড়া, তাও বাদ পড়ার মতো অবস্থা। আঞ্জুয়ারার কোমল হৃদয়ে চিন্তার চাবুক দিন-রাত আঘাত হানতে থাকে সকলের অজান্তেই। তবুও তিনি এক সময় ভেবে চিন্তে স্থির করেন যে লেখাপড়াই হতে পারে তার অভাবমুক্তির একমাত্র পথ। অত্যন্ত অভাবের মধ্যে তিনি পড়ালেখা চালিয়ে যেতে প্রতিজ্ঞা করেন। স্বামীর বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করার প্রতি আসে নানা বাধা বিপত্তি। সব বাধা বিপত্তি পেরিয়ে তিনি নিয়মিত লেখাপড়া চালিয়ে যেতে থাকেন। দিন যায়, মাস যায়, পার হয় কষ্টের বছর। এমনি করে তিনি সামনের দিকে এগোতে থাকেন। তার পরিচিত জগতের দিকে, সমাজের দিকে যখন তাকান, তখন তিনি দেখতে পান তার মতো আরো অনেক নারী কষ্টের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তিনি তাদের মতো মিলিয়ে যেতে চান না। তিনি চান কী করে নিজেকে অভাব থেকে মুক্ত করা যায় এবং তার মতো নিঃস্ব নারীর অবস্থার পরিবর্তন কীভাবে করা যায় সেই পথ খুঁজে বের করতে। তার এ স্বপ্ন একদিন তার কাছে ধরা দেয়।

বর্তমানে তিনি একজন সমাজসেবী। গত ইউপি নির্বাচনে (২০১১ সালের) তিনি সংরক্ষিত আসনে মহিলা মেম্বার পদে ভেলাবাড়ি ইউপিতে নির্বাচিত হয়েছেন। আগে থেকেই তার ইচ্ছা ছিলো নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নারীর উন্নয়ন ঘটানো। এমনি সময় তিনি স্থানীয় শাসন প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়ে প্রকল্পের সকল কাজে সহযোগিতা করা শুরু করেন। গত জানুয়ারি মাসে স্থানীয় শাসন প্রকল্পে স্যাপ-বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত "জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ" গ্রহণ করেন। এরপর তিনি প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ভেলাবাড়ি ইউপিতে নারী-পুরুষ সমতা আনয়নের জন্য জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। দরিদ্র-হতদরিদ্র নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও জীবনমানের পরিবর্তন করতে বেশ কিছু সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এসব পদক্ষেপ ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত হওয়াও শুরু হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তিনি তার নেতৃত্বে ইউপিতে মহিলা টয়লেট স্থাপন করেছেন এবং মহিলাদের বসার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করেছেন। ভেলাবাড়ি ইউপির বিভিন্ন কমিটিতে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। সমাজে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের কমিটিতে নারীর প্রবেশ নিশ্চিত ও নারীরাও যে মতামত প্রদান করতে পারেন তা তিনি প্রমাণ করতে পেরেছেন।

সর্বোপরি নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনারে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সবসময়ই তিনি সোচ্চার। এই ইউনিয়ন পরিষদে বিভিন্ন কাজে দরিদ্র-অতিদরিদ্র নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এবং নারী শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি অর্জন করতে আঞ্জুয়ারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা করছেন। তার নির্বাচনী ৩টি ওয়ার্ডে সকল নারী তাদের অধিকার সম্পর্কে এখন অনেক কিছু জানেন। প্রয়োজনে নিজেরাই ইউপিতে তাদের অধিকার আদায়ে বা অন্য যেকোনো কাজে অনায়াসে প্রবেশ করতে পারেন। এই ইউনিয়নের চেয়ারম্যানসহ সকল সদস্য নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি ও নারী অধিকার আদায় বিষয়ক সকল কাজে তাকে সহযোগিতা করেন।

ইউপি সদস্য আঞ্জুয়ারা বলেন- *"আমি নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার লেখা বই পড়েছি, বেগম রোকেয়ার জীবনী পড়েছি, আর শত দুঃখ-কষ্টের মাঝেও নিজেকে তার মতো ভেবেছি। ভেবেছি, আমি যদি বেগম রোকেয়া হতে পারতাম"।*

আজুয়ারা স্বপ্ন দেখেন- আগামীতে তার ইউনিয়নের অবহেলিত এবং নির্যাতিত সকল নারী ক্ষমতায়িত হবেন এবং সমাজে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে বসবাস করতে সক্ষম হবেন।

**মোঃ আব্দুল কাফী**, ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটর
স্থানীয় শাসন প্রকল্প, স্যাপ বাংলাদেশ

## শিবপুর ইউনিয়নের নারী শ্রমিকরা ইরি মৌসুমে পুরুষের সমান মজুরি পেয়েছেন

শিবপুর ইউনিয়ন পরিষদ গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার একটি ইউনিয়ন পরিষদ। উপজেলা সদর থেকে এই ইউপির দূরত্ব প্রায় ৬ কিলোমিটার। ইউনিয়ন পরিষদটির কোনো নিজস্ব ভবন নেই। ইউনিয়ন পরিবারকল্যাণ কেন্দ্রের কিছু অংশ শিবপুর ইউনিয়ন পরিষদের কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এখানে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাও নেই। নেই অন্যান্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা। তার পরও ইউনিয়ন পরিষদটির কার্যক্রম চলছে সক্রিয়ভাবেই।

স্থানীয় শাসন প্রকল্পের আওতায় গত জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হয় "অংশগ্রহণমূলক জেন্ডার বিশ্লেষণ প্রশিক্ষণ"। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ তৌফিকুল ইসলাম প্রধান শাহীনসহ অন্যান্য সদস্য ও বিভিন্ন কমিটির সদস্যরা নারী অধিকার বিষয়ে সচেতন হয়েছেন। তারা নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছেন। পরিষদে কক্ষ সংকট থাকা সত্ত্বেও মহিলাদের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে আলাদা বসার কক্ষ। করা হয়েছে আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা। স্ট্যান্ডিং কমিটিসহ প্রায় প্রত্যেকটি কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে নারী। যা ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। পূর্বে কিছু নির্বাচিত মহিলা সদস্যের পরিবর্তে তাদের স্বামীরা প্রতিনিধি হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদে ভূমিকা পালন করতেন, এখন আর তেমন দেখা যায় না। চেয়ারম্যান সাহেবের জোরালো পদক্ষেপের কারণে মহিলা সদস্যরা নিজেরাই নিজেদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিটি বরাদ্দে নারী সদস্যদের অংশীদারিত্ব সমান করা হয়েছে। বিভিন্ন কমিটিতে সংরক্ষিত মহিলা আসনের নারী সদস্যদেরকে সভাপতি হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। ইউপির সভাসমূহে নারী সদস্যদের উপস্থিতি ১০০% নিশ্চিত হয়েছে। ইউনিয়নের যে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সকলের বিশেষ করে নারী সদস্যদের মতামতের গুরুত্ব দেয়া হয়।

লক্ষ্য করা গেছে, এই ইউনিয়নে বিভিন্ন দিবস পালনের অনুষ্ঠানে এবং ইউনিয়নের কার্যক্রমে দরিদ্র-হতদরিদ্র নারীসহ সকল শ্রেণি ও পেশার নারীকে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন অনুষ্ঠানে ইউনিয়নের সকল স্তরের নারীর অংশগ্রহণ ছিলো উল্লেখ করার মতো। নারী দিবসের র‍্যালি শেষে চেয়ারম্যান সাহেব তার বক্তব্যে বলেন- *"যেহেতু বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী, সেহেতু দেশের উন্নয়নের সকল কাজে নারীর অংশগ্রহণ সমান থাকাটাই আজ সময়ের দাবি। আর ইউনিয়ন পরিষদ হচ্ছে দেশের উন্নয়নের স্থানীয় প্রতিষ্ঠান। ইউনিয়নের কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমেই দেশের উন্নয়নের কাজে অংশগ্রহণ করবেন নারী"*।

নারী-পুরুষের মজুরি বৈষম্য নিরসনে ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। জেন্ডার বিশ্লেষণ প্রশিক্ষণের পর ইউপির মাসিক সভায় নারী-পুরুষের মজুরি বৈষম্য দূরীকরণে ইউনিয়ন পরিষদের প্রত্যেক ওয়ার্ডে একটি করে আলোচনা সভা আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়। তারই ফলশ্রুতিতে ৪নং ওয়ার্ডে অনুষ্ঠিত সভায় হতদরিদ্র স্বভাবনেতা মনোয়ারা বেগম বলেন, *"আগেতো হামরা পুরুষের সমান কাজ করেও মজুরি কম পাইতাম। এবার ইরি মৌসুমে হামরা পুরুষের সমান মজুরি পাই।"*

চেয়ারম্যান সাহেব বলেন,*"তার স্বপ্ন শিবপুর ইউনিয়নের সকল নারীর সমানাধিকার নিশ্চিত করাসহ দরিদ্র ও হতদরিদ্র নারীর জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা।"*

**সুলতানা জামান**, ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটর
স্থানীয় শাসন প্রকল্প, স্যাপ বাংলাদেশ

## ইউনিয়ন পরিষদ নারীদের জন্য পৃথক টয়লেট নিশ্চিত করেছে

গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলার গজারিয়া ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্যরা নির্বাচিত হবার পর ইউনিয়ন পরিষদে পুরুষ সদস্যদের পাশাপাশি তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রথম থেকেই সোচ্চার ছিলেন।

কিন্তু তাদের অধিকার কী? এ বিষয়ে তারা ছিলেন দ্বিধাগ্রস্ত। কোথায়, কীভাবে তারা নিজেদের অধিকার বিষয়ে সঠিকভাবে জানতে পারবেন এবং কীভাবে অধিকার আদায় করা যায় সে সম্পর্কে তেমন কিছু জানতেন না। এমতাবস্থায় ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আর্থিক সহযোগিতায় কেয়ার বাংলাদেশ-এর সহায়তায় স্যাপ-বাংলাদেশ ও এসকেএস ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত স্থানীয় শাসন প্রকল্পের আওতায় গজারিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার ও সংরক্ষিত মহিলা মেম্বাররা এ যাবৎ ৪টি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এসব প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে তাদের দক্ষতা বেড়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের এই সকল প্রতিনিধি নিজেদের দায়িত্ব-কর্তব্য, দারিদ্র্য ও জেন্ডার বিশ্লেষণ প্রভৃতি বিষয়ে জানতে পেরেছেন। জেন্ডার বিশ্লেষণ প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর থেকে নারী সদস্যরা ফুলছড়ি ইউনয়নের নারী-অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেতন হয়েছেন। তারা ইউনিয়ন পরিষদে নারীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে চেয়ারম্যানের নিকট বিভিন্ন দাবি-দাওয়া পেশ করেন। বিভিন্ন ফোরাম ও সভায় অধিকার আদায়ে বক্তব্য পেশ করতে থাকেন। গজারিয়া ইউনিয়নের নারী সদস্য আয়শা শেখ এক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তাদের সেসব দাবি-দাওয়ার মধ্যে অন্যতম ছিলো নারীদের জন্য আলাদা টয়লেট নিশ্চিত করা। গাইবান্ধা জেলায় স্থানীয় শাসন প্রকল্পভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদগুলোর একটিতেও নারীদের জন্য আলাদা টয়লেট ছিলো না। চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য পুরুষ সদস্যরা এই দাবির যৌক্তিকতা উপলব্ধি করে তাদের প্রস্তাবে রাজি হন। ফলে গজারিয়া ইউনিয়ন পরিষদে প্রথম মহিলা টয়লেট স্থাপিত হয় ২০১১ সালের অক্টোবরে। আয়শা শেখ বলেন, *"যদি দেশের প্রত্যেকটি ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের জন্য পৃথক টয়লেট নিশ্চিত করা হয়, তাহলে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে নারীর সম্পৃক্ততা বাড়বে। সেইসাথে নারীর নিরাপত্তা এবং মর্যাদাও আরেক ধাপ বাড়বে।"* আয়শা শেখ প্রকল্পের সকলের নিকট জোরালো অনুরোধ জানান, *"অন্তত স্থানীয় শাসন প্রকল্পভুক্ত সকল ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে যেন মহিলাদের জন্য আলাদা বসার জায়গা ও টয়লেটের ব্যবস্থা করা হয়।"* তার এই প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে স্যাপ বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে এ বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া হয়। স্থানীয় শাসন প্রকল্পভুক্ত সকল ইউনিয়ন পরিষদের সাথে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়। অধিকাংশ ইউনিয়ন পরিষদ ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। এরই ফলশ্রুতিতে এপর্যন্ত ২৬টি ইউনিয়ন পরিষদ মহিলাদের জন্য আলাদা টয়লেট নিশ্চিত করেছে।

গজারিয়া ইউনিয়ন পরিষদের অনুকরণে অন্যান্য ইউনিয়ন পরিষদও আলাদা টয়লেট নিশ্চিত করায় আয়শা শেখসহ গজারিয়া ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যরা আরো অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তারা ইউনিয়ন পরিষদসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও নারীর অধিকার আদায়ে এবং নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করতে ইচ্ছুক। আয়শা শেখ বলেন,"তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হচ্ছে গজারিয়া ইউনিয়ন পরিষদসহ দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে মহিলা গ্রাম পুলিশ নিয়োগের জন্য কাজ করা এবং ইউনিয়ন পরিষদের সরকারি-বেসরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে নারী কর্মীর সংখ্যা বাড়নোর লক্ষ্যে কাজ করা।"

**মোঃ আঃ রাজ্জাক, প্রজেক্ট অফিসার**
**স্থানীয় শাসন প্রকল্প, স্যাপ বাংলাদেশ**

## দারিদ্র্য থেকে মুক্তির লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন গজারিয়া নদীর কিনার মহিলা সমিতির সদস্যরা

দরিদ্র ও হতদরিদ্র নারীর/পরিবারের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা "গজারিয়া নদীর কিনার মহিলা সমিতি" মুষ্টি চাউল সঞ্চয়ের মাধ্যমে প্রায় ২৯ হাজার টাকার তহবিল গড়ে তুলেছে। নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে জমানো টাকা থেকে তারা সংগঠনের দরিদ্র-হতদরিদ্র সদস্যদের ছেলে-মেয়েদের বিয়ের সময় ঋণ দেন। অভাবের সময় নিজেরা ঋণ নেন এবং ইতিমধ্যেই পাড়ার কয়েকটি হতদরিদ্র পরিবারকে কিছু টাকা ঋণও দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, ২০০৯ সালে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে, কেয়ার বাংলাদেশ-এর সহযোগিতায় স্যাপ-বাংলাদেশ ও এসকেএস ফাউন্ডেশন গজারিয়া ইউনিয়নে স্থানীয় শাসন প্রকল্প (Local Governance Project) বাস্তবায়ন শুরু করে। প্রকল্পের শুরুতেই গজারিয়া ইউনিয়নে ক্ষমতা ও সম্পদের মানচিত্র (Power & Resource Map) তৈরি এবং প্রাথমিকভাবে ২৭টি হতদরিদ্র পাড়া চিহ্নিত করা হয়। এই ২৭টি হতদরিদ্র পাড়ার মধ্যে ৯টি পাড়াকে কমিউনিটির সহায়তায় সবচেয়ে হতদরিদ্র পাড়া হিসেবে চূড়ান্তভাবে বাছাই করা হয়। কমিউনিটির অংশগ্রহণে ঐ ৯টি পাড়ায় সামাজিক মানচিত্র (Social Map), সচ্ছলতার শ্রেণিবিণ্যাস (Wellbeing Analysis) ও ঋতুভিত্তিক পঞ্জিকা (Seasonal Calendar) সামাজিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ৯টি দরিদ্র ও হতদরিদ্র সংগঠন গড়ে উঠেছে। এই ৯টি পাড়ার মধ্যে ১টি হচ্ছে যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত নীলকুটি বাঁধ পাড়া।

নীলকুটি বাঁধ পাড়ার সংগঠনের সভাপতি মোসাঃ হাসিনা এবং সাধারণ সম্পাদক মোসাঃ চায়না বেগম জানালেন তারা কয়েক বছর ধরে একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই অবস্থানে এসেছেন। তারা জানান যে, "এসকেএস ফাউন্ডেশনের ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটর এই পাড়ায় প্রথমে আমাদের সাথে সুশাসন প্রকল্পের ব্যাপারে আলাপ করেন। তখন আমাদের মনে ছিলো নানা ধরনের প্রশ্ন। এই কাজ কতোদিন চলবে? এই কাজ করে আমাদের কী লাভ হবে? ইত্যাদি। আমাদের কাছে তখন 'সুশাসন' ছিলো সম্পূর্ণ নতুন একটি বিষয়। তিনি কিছুদিন পর পর এসে আমাদের সাথে এসব বিষয়ে আলোচনা করতেন। একসময় তার সহায়তায় আমরা পাড়া ম্যাপ তৈরি (Social Map) করে খানা, শিক্ষা, ধর্মীয়, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় সম্পদ প্রভৃতি চিহ্নিত করি। সচ্ছলতার শ্রেণিবিন্যাসকরণ

(Wellbeing Analysis) করে ধনী, মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত, দরিদ্র ও হতদরিদ্র পরিবারগুলোকেও চিহ্নিত করি। সবশেষে ঋতুভিত্তিক পঞ্জিকা (Seasonal Calendar) তৈরি, মৌসুমভিত্তিক কাজ, অভাব বা মন্দার সময় কাজের সন্ধানে বাইরে যাওয়া, সেসময় মহাজনী ঋণ/চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করি। সকলে মিলে এই অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ খোঁজা শুরু করি। আলোচনায় এসবের কারণ হিসেবে বেরিয়ে এসেছে নদীভাঙন, নিজস্ব বসতভিটা না থাকা, অসচেতনতা, নিজেদের মধ্যে একতা/সংহতির অভাব, ভূমিহীনতা, স্থানীয়ভাবে কাজ না থাকা ও প্রত্যন্ত অঞ্চল প্রভৃতি। আমরা চিহ্নিত এইসব সমস্যা মোকাবিলা করার মাধ্যমে হতদরিদ্র অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে কাজ শুরু করি। পাড়ার মোট ৩৩টি দরিদ্র ও হতদরিদ্র পরিবার মুষ্টি চাল সঞ্চয় করা শুরু করি।"

এভাবেই নীলকুটি বাঁধের দরিদ্র ও হতদরিদ্র পরিবারের নারী একত্রিত হয়ে গজারিয়া নদীর কিনার মহিলা সমিতি গঠন করেন। তারা প্রথমে প্রতি সপ্তাহে আধা পোয়া (১২৫ গ্রাম) করে চাল সঞ্চয় করা শুরু করলেও বর্তমানে এক পোয়া (২৫০ গ্রাম) করে চাল সঞ্চয় করছেন। সমিতি পরিচালনার জন্য ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যকরী কমিটি আছে। সমিতির হিসাব সংরক্ষণের জন্য একজন ক্যাশিয়ারও আছেন। সঞ্চয়ের পাশাপাশি প্রতি মাসে সভা করে ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, স্থানীয় সেবা ও সম্পদে প্রবেশাধিকারের সুযোগ সৃষ্টিসহ নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন সংগঠনের সদস্যরা। তাদের এইসব কর্মকাণ্ডের ফলে ইউনিয়ন পরিষদের সাথে পাড়াবাসীর যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা প্রাক বাজেট সভা (ওয়ার্ড সভা), উন্মুক্ত বাজেট সভায় (ওপেন বাজেট মিটিং) অংশগ্রহণ করছেন এবং ইউনিয়ন পরিষদ, স্বভাবনেতা সংগঠন ও কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠনের সাথে বিভিন্ন দিবস পালন করছেন। স্ট্যান্ডিং কমিটিসহ ইউপির বিভিন্ন কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। পাড়ায় বাল্যবিবাহ বন্ধ হয়েছে। তারা স্থানীয় সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করছেন। সংগঠনের সদস্যরা বিশ্বাস করেন তারা গজারিয়া নদীর কিনার মহিলা সমিতির মাধ্যমে ধীরে ধীরে একদিন দারিদ্র্যাবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে সুখ ও সমৃদ্ধির পথ খুঁজে পাবেন।

**গোলাম রসুল, ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটর**
**স্থানীয় শাসন প্রকল্প, এসকেএস ফাউন্ডেশন, গাইবান্ধা**

## মঞ্জুয়ারার স্বপ্ন: স্বাবলম্বী হবেন, সুবিধাবঞ্চিত নারীর উন্নয়নে কাজ করবেন

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রতম জেলাগুলোর মধ্যে গাইবান্ধা অন্যতম। এই জেলার ফুলছড়ি উপজেলার মানুষ দীর্ঘদিন থেকে নদীভাঙনের শিকার। বলা যায় নদীভাঙন এই অঞ্চলের একটি স্থায়ী সমস্যায় পরিণত হয়েছে। নদীভাঙনের ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ অত্যন্ত নাজুক অবস্থার মধ্যে জীবন যাপন করছে। এই উপজেলার উদাখালী ইউনিয়নের হরিপুর গ্রামের উঁচারভিটার ১নং ওয়ার্ডে মোছাঃ মঞ্জুয়ারা বেগমের বসবাস। তিনি ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। তার বাবার নাম মোঃ মনছুর আলী। পেশায় ফেরিওয়ালা। মায়ের নাম মোছাঃ নজিরন বেগম। পেশায় গৃহীনি।

২০০২ সালে একই ইউনিয়নের খামার বোয়ালী দশকাউনিয়া গ্রামের মোঃ আশরাফ আলীর সাথে মঞ্জুয়ারার বিয়ে হয়। মঞ্জুয়ারার স্বামী আশরাফ আলী কর্মহীন। ফলে সংসারে ছিলো অভাব। এরই মধ্যে মঞ্জুয়ারার পরিবারে একটি পুত্র সন্তান জন্ম নেয়। এতে সংসারের অভাব আরো প্রকট হয়ে ওঠে। দায়িত্বজ্ঞানহীন আশরাফ আলী মঞ্জুয়ারার কাছে বোঝা হয়ে ওঠেন। পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে উপায়ান্তর না দেখে, একসময় মঞ্জুয়ারা তার বাবার সংসারে ফিরে আসেন। মঞ্জুয়ারার বাবার বাড়ির অবস্থাও অর্থনৈতিকভাবে ভালো না। ফলে, মঞ্জুয়ারার আগমনে তার বাবার বাড়িতেও তিনি খাওয়া-পরার কষ্টে পড়েন। দারিদ্র্যাবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে মঞ্জুয়ারা পাড়ার কয়েকটি ছোট শিশুকে প্রাইভেট পড়ানো শুরু করেন।

এইভাবে কয়েকটি বছর কেটে যায়। মঞ্জুয়ারা চেষ্টা করতে থাকেন কীভাবে দারিদ্র্যাবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ভাবতে থাকেন নিজের অবস্থার পরিবর্তনের পাশাপাশি সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও নারীর অধিকার রক্ষায় ভূমিকা পালনের উপায় নিয়ে। এই অবস্থায় ২০০৯ সালের আগস্ট মাসে উদাখালী ইউনিয়নে স্থানীয় শাসন প্রকল্প কাজ শুরু করে। স্থানীয় পর্যায়ে প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে দরিদ্রবান্ধব ও জেন্ডার সংবেদনশীল স্থানীয় সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ এই প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য।

প্রকল্পের সহায়তায় হরিপুর গ্রামের উঁচারভিটায় সামাজিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে পাড়া দল গঠন করা হয়। দারিদ্র্যাবস্থা থেকে মুক্তি পাবার লক্ষ্যে পাড়াবাসীরা যৌথ উদ্যোগে মুষ্টি চাউল দল গঠন করে। এই দল গঠনের ক্ষেত্রে মঞ্জুয়ারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। মঞ্জুয়ারার নেতৃত্বে পাড়াবাসী নারী নির্যাতন ও বাল্যবিবাহ রোধে কাজ শুরু করেন। মঞ্জুয়ারা তার নেতৃত্বগুণে স্বভাবনেতা হিসেবে বিবেচিত হন। তিনি প্রকল্পের আওতায় লোকাল গভার্নেন্স প্রশিক্ষণ এবং অ্যাডভোকেসি ও লবিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ইউনিয়ন পরিষদের প্রাক বাজেট সভা (ওয়ার্ড সভা), উন্মুক্ত বাজেট সভায় তিনি নিয়মিত অংশগ্রহণ করছেন এবং পাড়ার অন্যান্য দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষকে এসব সভায় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করছেন।

একসময় যে মঞ্জুয়ারা লোকলজ্জায় জনসম্মুখে কথা বলতে পারতেন না, সেই মঞ্জুয়ারাই আজ সাংগঠনিক দক্ষতার পুরস্কারস্বরূপ উদাখালী ইউনিয়ন স্বভাবনেতা সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মনোনীত

হয়েছেন। স্থানীয় শাসন প্রকল্পের পক্ষ থেকে ২০১১ সালের নভেম্বরে স্থানীয় সিবিও (চেতনা লোককেন্দ্র) এবং উদাখালী ইউনিয়ন স্বভাবনেতা সংগঠনকে (এনএলও) সাংগঠনিক সহায়তার আওতায় যথাক্রমে ৩০ হাজার টাকা ও ৩২ হাজার ৫ শত টাকা অনুদান দেওয়া হয়। সংগঠন দুটি এই টাকা দিয়ে হতদরিদ্র নারীকে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে শপিং ব্যাগ/ঠোঙ্গা তৈরির প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। চেতনা লোককেন্দ্রের কয়েকজন প্রশিক্ষিত দরিদ্র নারীসদস্য এই প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন। স্বভাবনেতা সংগঠনের পক্ষ থেকে মঞ্জুয়ারা এই প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত হন। প্রশিক্ষণ শেষে অন্যান্য হতদরিদ্র নারীর মতো তিনিও অনুদানের টাকা থেকে ১ হাজার ৫ শত টাকা ঋণ গ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে পুঁজি করে বর্তমানে মঞ্জুয়ারা তার বাড়িতে শপিং ব্যাগ/ঠোঙ্গা তৈরির কাজ শুরু করেছেন। যদিও শুকনো মৌসুম ছাড়া শপিং ব্যাগ তৈরি করা যায় না; তবে শপিং ব্যাগ তৈরি করতে পারলে মাসে ৭০০-৮০০ টাকা আয় হয়। মাঝেমধ্যে তিনি ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত ছেলেমেয়েদেরকে প্রাইভেট পড়ান এবং বাবা-মাকে মুদি দোকানে সহযোগিতা করেন। এতে তার মাসে আরো ১৭৫০-১৮০০ টাকা আয় হয়। মঞ্জুয়ারা তার আয় থেকে সংসারের কিছু ব্যয় নির্বাহ করার পরও সঞ্চয় করে একটি ভেড়া কিনেছেন। ভেড়াটির একটি বাচ্চা হয়েছে।

বর্তমানে মঞ্জুয়ারা একদিকে যেমন শপিং ব্যাগ ও ঠোঙ্গা তৈরির মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে চান, অন্যদিকে তেমনি তিনি সামাজিক কুসংস্কারকে ডিঙিয়ে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত নারীর উন্নয়নেও কাজ করতে চান।

**মোঃ আনিছুল হক প্লাবন, ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটর**
**স্থানীয় শাসন প্রকল্প, এসকেএস ফাউন্ডেশন, গাইবান্ধা**

## পাড়া উন্নয়ন কমিটির উদ্যোগ বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তা

নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার বাঙালিপুর ইউনিয়নের বাঙালিপুর গ্রামের ৩ নং ওয়ার্ডের একটি হতদরিদ্র পাড়ার নাম বয়েত পাড়া। পাড়াটির অধিকাংশ জনগণ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। পাড়াটিতে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অশিক্ষা, জলাবদ্ধতা ইত্যাদি নানান রকম সমস্যা বিদ্যমান। এভাবেই সমস্যার সাথে সন্ধি করে চলছিলো বয়েতপাড়াবাসীরা। অবশেষে পাড়া উন্নয়ন কমিটির একদল স্বউদ্যোগী নারী সদস্য ও স্বভাবনেতাদের সক্রিয় যোগাযোগের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতা তথা নিজস্ব অর্থায়নে পানি নিষ্কাশনের জন্য নির্মিত হয় ২৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের একটি ড্রেন।

বয়েত পাড়ায় কেয়ার বাংলাদেশ সেতু প্রকল্প আরবিএনএস টিম ২০১০ সালে কাজ শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় পাড়াবাসীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গঠন করেন পাড়া উন্নয়ন কমিটি। এরপর এ পাড়ার মানুষজন একসময় তাদের পাড়ার বিভিন্ন সমস্যাগুলো নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। পাড়াবাসীর নিয়মিত এক সভায় কর্মপরিকল্পনা তৈরি করার সময় পাড়ার বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করা হয়। অন্যান্য সমস্যার মধ্যে 'বর্ষাকালে প্রতিটি বাড়িতে ও রাস্তায় পানি জমে থাকা' একটি বড় সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয়। এই সমস্যাটি পাড়াবাসীর চলাচল ও স্বাভাবিক কাজকর্মে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ পাড়ার মানুষজন অনেক দিন ধরেই এই সমস্যায় ভুগছিলেন। পাড়ার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা পানি নিষ্কাশনের জন্য বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করেও এর কোনো সমাধান মেলেনি। একসময় তারা আশা ছেড়ে দেন।

অবশেষে পাড়া উন্নয়ন কমিটির (এই কমিটির ৭ জন সদস্যের মধ্যে ৪ জন নারী) নারী সদস্য জাকিয়া বেগম, আলিমা বেগম, শেফালী বেগম এবং পাড়ার উদীয়মান তরুণ স্বভাবনেতা ফাতেমা বেগম ও জাকির হোসেন সকলে মিলে আলোচনা করেন কিভাবে সমস্যাটি সমাধান করা যায়। পরবর্তীতে তারা পাড়াবাসীদের নিয়ে একটি সভা করেন এবং আলোচনার মাধ্যমে সকলকে এই সমস্যাটির সমাধানে পাড়াবাসীকে এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করেন। সেই সাথে বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করার জন্য পাড়া উন্নয়ন কমিটি, স্বভাবনেতা ও পাড়ার অন্যান্য সদস্যদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটির সক্রিয় যোগাযোগের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড মেম্বার মোঃ ওবায়দুল হক বাচ্চু, একই ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্য মোছাঃ নাজমা বেগম, সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান ডাঃ মোঃ শাহাজাদা সরকার বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হন এবং এই বিষয়ে পাড়ার সকলকে নিয়ে সভা করেন। সভা শেষে তারা পাড়া ভ্রমণ করে সিদ্ধান্ত নেন পানি নিষ্কাশনের জন্য একটি ড্রেন করার।

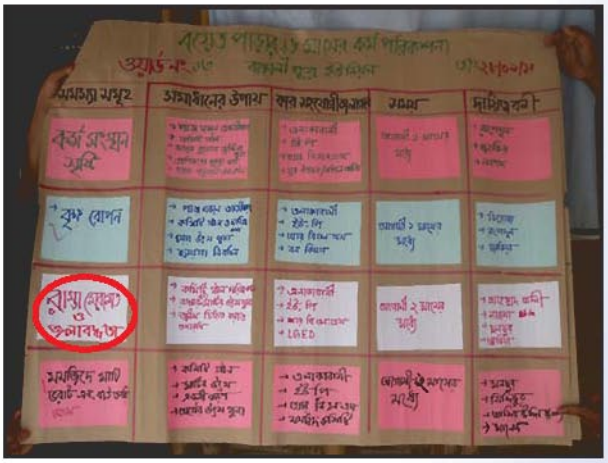

অবশেষে, ২০১১ সালের জুলাই মাসের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদের সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে ২৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের একটি ড্রেন নির্মাণ করা হয়। এই ড্রেন পাড়ার মূল জায়গা থেকে শুরু হয়েছে এবং প্রধান সড়কে গিয়ে মিশে গেছে। ড্রেনটি তৈরি করতে মোট ব্যয় হয় ১ লক্ষ টাকা। এই ড্রেন তৈরির ফলে পাড়ার ৫৮টি পরিবার জলাবদ্ধতার কবল থেকে মুক্তি পায়। এভাবেই পাড়াবাসীর স্বপ্ন সত্যি হলো। এখন ভরা বর্ষায়ও পাড়ার শিশুরা স্কুলে যায়, কৃষক মাঠে যায়, বয়স্ক ও বৃদ্ধরা হাঁটে নির্ভয়ে। মূলতঃ এই ড্রেনটি হওয়াতে পাড়ার যোগাযোগ ব্যবস্থায় এসেছে নান্দনিক গতি।

সবচেয়ে বড় পাওয়া হলো পাড়ার সাথে ইউপির কার্যকরী সম্পর্ক স্থাপন। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করতেই হয়; তা হলো এই ড্রেনটি করতে পেরে পাড়া উন্নয়ন কমিটির নারী সদস্য ও স্বভাবনেতাদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে বহুগুণে।

সেই সাথে পাড়াবাসীর কাছে বেড়েছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা। আর এই পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে পাড়ার অন্যান্য নারীর ক্ষেত্রেও। বর্তমানে পাড়ায় কোনো সমস্যা দেখা দিলে বা বিচার সালিশিতে পাড়া উন্নয়ন কমিটির নারী সদস্য ও নারী স্বভাবনেতাদের কাছে সমাধান চাওয়া হয়। সেই সাথে পাড়ার সকল উন্নয়ন কার্যক্রমে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের মতামত মূল্যায়ন করা হয়। এখন যে কোনো ধরনের সমস্যা নিয়ে স্থানীয় সরকার বা অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করতে তারা অধিপরামর্শকের ভূমিকা পালন করছেন। এখানে শক্তি হিসেবে কাজ করেছে পাড়াবাসীর একতা ও তাদের সক্রিয় যোগাযোগ। এই ড্রেনটি তৈরি হবার ফলে এলাকার সকলেই খুব খুশি; কারণ এখন থেকে ভরা বর্ষায়ও তারা তাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম ও চলাচল বজায় রাখতে পারবেন।

সংকলনে
রওশন রহমান, ডকুমেন্টেশন অফিসার
সেতু প্রকল্প, কেয়ার বাংলাদেশ

## রোজিফা বেগম বেতকাপা ইউপিকে একটি মডেল ইউপি বানাতে চান

স্থানীয় শাসন প্রকল্প (Local Governance Project) ২০০৯ সালের আগস্ট মাস থেকে গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ি উপজেলার ৬নং বেতকাপা ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাথে কাজ করছে। মোছাঃ রোজিফা বেগম মিনা ২০১১ সালের জুন মাসে এই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। ছাত্র জীবন থেকে রাজনীতি করছেন। গ্রামীণ ব্যাংকে প্রায় ১২ বছর চাকরি করেছেন। তার নেতৃত্বে এক বছরের মধ্যে (২০১১-২০১২) পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রমে প্রশংসনীয় অবদান রাখার জন্য বেতকাপা ইউনিয়ন পরিষদ পলাশবাড়ি উপজেলার শ্রেষ্ঠ ইউনিয়ন পরিষদ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। জনগণের সুবিধার্থে রোজিফা নিজ খরচে নাগরিকত্ব/চারিত্রিক সনদপত্র মুদ্রণ করে দিয়েছেন। সুশাসন বার্তা'র পক্ষ থেকে গত ২৬ জুলাই ২০১২ তারিখে বেতকাপা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-এর একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

**সুশাসন বার্তা:** আপনি কেন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন?

**রোজিফা বেগম:** স্বামীর চাকরি সূত্রে দেশের বিভিন্ন জেলায় আমার থাকার সুযোগ হয়েছে। অনেক ইউনিয়ন পরিষদ দেখেছি। আমার কাছে সবসময় মনে হয়েছে আমাদের বেতকাপা ইউনিয়ন পরিষদ অনেক পিছিয়ে আছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না, অধিকাংশ গ্রামে বিদ্যুৎ নেই। নেই ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব ভবন। এখানে টাকা ছাড়া মানুষ কোনো সেবা পায় না। তাই আমি আমার এলাকার মানুষের সমস্যা সমাধানে এবং ইউনিয়নবাসীর বিশেষ করে দরিদ্র মানুষের উন্নয়নের জন্য নির্বাচন করেছি। আমি বেতকাপা ইউনিয়ন পরিষদকে একটি মডেল ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। নির্বাচনের সময় আমার ওয়াদা ছিলো - বেতকাপা ইউনিয়নের সেবা পেতে সাধারণ মানুষ যে হয়রানির শিকার হন, সেটা কমাবো, বিনা পয়সায় মানুষকে নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট দেবো, দারিদ্র্য বিমোচনে রাস্তার দুই ধারে ঔষধি ও ফলজ গাছ লাগাবো ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করবো।

**সুশাসন বার্তা:** একটি ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) "সকল উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিৎ" বলে আপনি মনে করেন কি? কেন মনে করেন?

**রোজিফা বেগম:** অবশ্যই একটি ইউনিয়ন পরিষদ সকল উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিৎ। কারণ ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় মানুষের সবচেয়ে কাছের প্রতিষ্ঠান। যে কোনো কাজে বা সমস্যায় মানুষ সবার আগে ইউনিয়ন পরিষদের দারস্থ হয়। তাই সরকারের সকল উন্নয়ন কাজ যদি ইউপি কেন্দ্রিক হয় তাহলে স্থানীয় মানুষ বিশেষকরে দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষ সব ধরনের সেবা পাবে। নিঃস্ব হওয়ার হাত থেকে রেহাই পাবে। সহজে অল্প পয়সায় সুবিচার পাবে। এলাকায় চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত হবে। কুটিরশিল্প

গড়ে তোলার মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস পাবে।

**সুশাসন বার্তা:** আপনি কি মনে করেন দারিদ্র্য বিমোচনে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনগণ বিশেষ করে দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের সম্পৃক্ত করার প্রয়োজন আছে?

**রোজিফা বেগম:** অবশ্যই। ইউপি কার্যক্রমের সকলক্ষেত্রেই স্থানীয় জনগণ বিশেষ করে দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষ ও নারীকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। এতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

**সুশাসন বার্তা:** বেতকাপা ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় জনগণ বিশেষ করে দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের অন্তর্ভুক্তিতে কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে?

**রোজিফা বেগম:** বেতকাপা ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় জনগণ বিশেষ করে দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের স্ট্যান্ডিং কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এখন স্ট্যান্ডিং কমিটির মিটিং নিয়মিত হয়। রেজুলেশন লেখা হয়। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হয়। সরকারের সেফটিনেট সহায়তা বিতরণের পূর্বে প্রকৃত উপকারভোগী বাছাইয়ের জন্য এলাকার দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের সহায়তা নেওয়া হচ্ছে। বয়স্কভাতা বিতরণে নারীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিন স্থাপন, কালভার্ট তৈরি, ড্রেনেজ নির্মাণ, শিক্ষা উপকরণ বিতরণসহ বিভিন্ন প্রকল্প কমিটিতে দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। ওয়ার্ড ও উন্মুক্ত বাজেট সভায় সক্রিয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

পাশাপাশি বেতকাপা ইউনিয়ন পরিষদ স্ব-মূল্যায়ন করেছে, দীর্ঘমেয়াদি ভিশন ও কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেছে, নিয়মিত মাসিক সভা করা হচ্ছে, সরকার নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ইউপি অফিস খোলা থাকে, সেফটিনেট সহায়তা প্রদানে হতদরিদ্রদের তালিকা সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা হচ্ছে, ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সমন্বয় সভা হচ্ছে, দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষের সাথে সমন্বয় সভা করা হচ্ছে।

**সুশাসন বার্তা:** জনগণকে বিশেষ করে দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষকে সম্পৃক্ত করার কোনো সুফল কি পাওয়া যাচ্ছে?

**রোজিফা বেগম:** স্থানীয় সুশাসন প্রতিষ্ঠায় স্থানীয় জনগণ বিশেষ করে দরিদ্র ও হতদরিদ্রদেরকে সম্পৃক্ত করার ফলে আমরা ইতিমধ্যে কিছু সুফল পাওয়া শুরু করেছি। যেমন; ত্রাণ ও সেফটিনেট সহায়তা অপ্রতুল হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত উপকারভোগীরা ত্রাণ ও সেফটিনেট সহায়তা পাচ্ছেন। এতে জনগণ খুশি। বেতকাপা ইউনিয়নে কর্মরত বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী সংস্থার তৎপরতা বেড়েছে। এনজিওরা হতদরিদ্র মানুষকে তাদের কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করছে। সরকারি সেবা প্রদানকারী সংস্থার সেবা ও উপকরণ প্রকৃত উপকারভোগীরা পাচ্ছেন। গ্রাম আদালত নিয়মিত বিচারকাজ পরিচালনা করছে। এতে মানুষ খুব অল্প খরচে ও দ্রুত সময়ে সুবিচার পাচ্ছে। গ্রাম আদালতের প্রতি জনগণের আগ্রহ বাড়ছে। কমিউনিটি ক্লিনিক ভালোভাবে চলছে। কয়েকটি স্থানে জনগণ কমিটি করে ইউপি থেকে রাস্তা লীজ নিয়ে দুইধারে গাছ লাগানোর কাজ শুরু করেছে।

**সুশাসন বার্তা:** আপনি কি বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ফোরামের সাথে সম্পৃক্ত?

**রোজিফা বেগম:** হ্যাঁ, আমি বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ফোরাম গাইবান্ধা জেলার সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করছি।

**সুশাসন বার্তা:** ফোরামের একজন কর্মকর্তা হিসেবে অংশগ্রহণমূলক গভর্নেন্স প্র্যাক্টিসটাকে এই ফোরামের মাধ্যমে অন্যান্য ইউপিতে ছড়িয়ে দেওয়ার কোনো পরিকল্পনা আপনার আছে কি না?

**রোজিফা বেগম:** হ্যাঁ, পরিকল্পনা আছে। তার আগে বেতকাপা ইউনিয়ন পরিষদকে একটি মডেল ইউপি হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।

**সুশাসন বার্তা:** বেতকাপা ইউপিকে একটি দরিদ্রবান্ধব ইউপি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

**রোজিফা বেগম:** ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের জ্ঞান ও দক্ষতা আরো বাড়ানো দরকার। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে সচেতন করার পাশাপাশি সকলকে সাথে নিয়ে নিয়ে কাজ করতে হবে। ইউপির মাসিক সভায় আলোচনার মাধ্যমে ইউপির বিভিন্ন কার্যক্রমে জনগণকে আরো সম্পৃক্ত করার উপায় খুঁজে বের করতে হবে। এতে প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা আসবে। জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে। দুর্নীতি হ্রাস পাবে। এছাড়া সেফটিনেট সহায়তা বৃদ্ধি করতে হবে। উপজেলা থেকে প্রকল্প অনুমোদন ও ছাড় করানোর প্রক্রিয়া আরো স্বচ্ছ করতে হবে অথবা জেলা পর্যায় থেকে সরাসরি প্রকল্প বরাদ্দ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। টেস্ট রিলিফের বরাদ্দ সরাসরি ইউনিয়ন পরিষদকে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

(রোজিফা বেগম যেন সত্যিই একদিন তার ইউনিয়ন পরিষদ 'বেতকাপা'কে একটি মডেল ইউপি বানাতে বদ্ধপরিকর। কথার ফাঁকে ফাঁকে, লক্ষ্য করা গেল রোজিফা বেগমের চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে সেই আত্মবিশ্বাসের আভা। এরপর একে অপরকে ধন্যবাদ জানানোর মধ্য দিয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ পর্বের সমাপ্তি ঘটলো।)

সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন:
**মোঃ সারওয়ার**, টেকনিক্যাল কো-অর্ডিনেটর
স্থানীয় শাসন প্রকল্প, কেয়ার বাংলাদেশ

## বিশ্ব পরিবেশ দিবসের ভাবনা

৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। ১৯৭২ সাল থেকে প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। জাতিসংঘ নির্ধারিত এই দিবসটি উদ্‌যাপনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হলো বিশ্ববাসীর পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি ও পরিবেশ উন্নয়নে রাষ্ট্র, সমাজ ও জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং পরিবেশ সংরক্ষণে মানুষের আচরণগত পরিবর্তন ও পরিবেশসম্মত স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে সকল শ্রেণির মানুষকে ক্ষমতায়িত করা ।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়, Green Economy; Does it Include you ? যার সহজ বাংলা

হলো "পরিবেশবান্ধব উন্নয়নে আপনিও গর্বিত অংশীদার হোন "-এই স্লোগানকে শুধুমাত্র পরিবেশ উন্নয়নের একটি স্লোগান হিসেবেই বিবেচনা করা হচ্ছে না বরং এটি স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের সর্বোৎকৃষ্ট সমাধান যা একটি সামাজিক কর্মসূচির রূপায়ন।

UN Working definition অনুযায়ী Green Economy মানবিক কল্যাণ ও সামাজিক সাম্যতার ধারণায় সংগঠিত, যেখানে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবেশগত ঝুঁকি এবং পরিবেশের বিপন্নতা কমে আসবে। উপরন্ত Green Economy র প্রেক্ষিতকে আমরা বিবেচনা করতে পারি এমন একটা পরিবেশসম্মত উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা যেখানে, কম মাত্রায় কার্বন নিঃসরণ হবে, নিশ্চিত হবে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং প্রতিষ্ঠিত হবে সকল শ্রেণির মানুষের সম অংশীদারিত্ব।

Green Economy ধারণা জন্ম নেয় কয়েক দশক আগে। তবে তা পূর্ণতা অর্জন করে ২০০৮ সালের শেষ দিকে UNEP এর সঞ্চালনায়। যার সম্মিলিত ও সর্বোপরি উদ্দেশ্য হলো, পরিবেশবান্ধব উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়ানো, পরিবেশের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্র সমূহকে নিয়ে গবেষণা করা এবং নীতি নির্ধারণে সহায়তা করা।

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বর্তমান বিশ্বের একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়। Inter Government Panel on Climate Change (IPCC) এর মতে যার জন্য বহুলাংশে দায়ী উন্নত বিশ্বের অতিমাত্রায় জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের ফলে মাত্রাতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণ। জলবায়ু পরিবর্তন মূলতঃ একটি অবিচারমূলক ইস্যু যা কিনা বৈশ্বিক পর্যায়ে অসমতার প্রতিফলন। দরিদ্র দেশগুলো যদিও এই সমস্যার জন্য দায়ী নয় কিন্তু সব চাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত তারাই। সুতরাং এ সমস্যা মোকাবিলায় সমন্বিত বহুপাক্ষিক সাড়া প্রদানের অংশ হিসেবে ধনী দেশগুলোর দায়িত্ব হলো জরুরি ভিত্তিতে গ্রিন-হাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাস এবং উন্নয়নশীল দেশের অভিযোজনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান করা।

IPCC ৪র্থ সমীক্ষা রিপোর্টে দক্ষিণ এশিয়াকে পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে বিপন্ন অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের মতে অবস্থান ও দুর্বল আর্থ-সামাজিক কারণে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে একটি অধিক ঝুকিপূর্ণ দেশ। এই বিপর্যয় দেশের কৃষি, পানিসম্পদ, বন ও জীববৈচিত্র্য, মানবসম্পদ, অবকাঠমো সহ মানুষের জীবন-জীবিকাকে করেছে দিন দিন অধিক ঝুঁকিপূর্ণ । সমস্যা সমাধানে আমাদের জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারি উদ্যোগে বিপন্ন মানুষের কণ্ঠ তুলে ধরা হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন ফোরাম ও সমাবেশে।

আমরা যদি বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিম জনপদ বিশেষ করে রংপুর অঞ্চলের দিকে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখা যাবে এই অঞ্চল ঝুঁকিতে থাকা অঞ্চলগুলোর অন্যতম। এখানে যেমন রয়েছে ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা অববাহিকার বন্যা প্লাবিত নিচু অঞ্চল তেমনি রয়েছে বরেন্দ্র অঞ্চল সংলগ্ন শুষ্ক ও উঁচু ভূমি। এই অঞ্চলে বাস করে দেশের অধিক দরিদ্র প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। যারা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও দুর্যোগের ঝুঁকির প্রতিনিয়ত শিকার। নদীর স্বাভাবিক প্রবাহে বাধার কারণে শুষ্ক মৌসুমে যেমন বাড়ছে খরা তেমনি বর্ষা মৌসুমে বাড়ছে বন্যার প্রকটতা। নদী ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে স্বল্প প্রবাহে দুই কূল প্লাবিত হচ্ছে, ভূগর্ভস্থ পানি নিচে নেমে যাচ্ছে, বৃষ্টিপাত হচ্ছে অনিয়মিত। পরিবেশবান্ধব আচরণবিমুখতার জন্য বিপন্ন হচ্ছে পরিবেশ, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কৃষি, ঝুঁকিতে নিমজ্জিত হচ্ছে দরিদ্র প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকা।

অসীম সম্ভাবনার দেশ আমাদের বাংলাদেশ। আমাদের রয়েছে পরিশ্রমী জনশক্তি, বিশ্বের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল, দেশব্যাপী মিঠা পানির আধার এবং দিনব্যাপী ঝক্‌ঝকে সূর্যালোক- যা পশ্চিমা বিশ্ব কল্পনাও করতে পারে না। আমদের সূর্য আগে ওঠে। প্রতিদিন গড়ে পশ্চিমাদের থেকে আমরা ৩/৪ ঘন্টা সূর্যালোক বেশি পাই-যা হবে আগামী দিনের সবচেয়ে বড় সম্পদ। দেশের বিপন্ন জনগোষ্ঠীও বসে নেই। তাদের স্ব-উদ্যোগ, সরকারি বে-সরকারি সহায়তায় গ্রহণ করছে বিভিন্ন অভিযোজন কৌশল। বাড়িতে সৌরবিদ্যুৎ, বায়ো গ্যাস, বন্যা ও খরা সহনশীল ধানের চাষ, বালুচরে মিষ্টি কুমড়ার চাষ, হাতে কলমে প্রশিক্ষণ নিয়ে গড়ে তুলেছে পরিবেশবান্ধব ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প যা শুধু তাদের জীবন জীবিকাতেই পরিবর্তন আনেনি; এই পরিবর্তনের পাশাপাশি তারা স্থাপন করেছে Green Economy বা পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের আদর্শ।

পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে সমন্বিত প্রয়াস ও সকলের সহযোগিতা। জনগোষ্ঠীর বংশপরম্পরালব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতার সাথে বৈজ্ঞানিক ধ্যান ধারণার সমন্বয় পরিবেশবান্ধব জীবন যাপন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে করতে পারে আরো গতিশীল। আমরা এই মঞ্চ থেকে রংপুর এলাকার জন্য সরকার ও উন্নয়ন সংস্থার নিকট সুনির্দিষ্ট বিশেষ কয়েকটি দাবি রাখতে চাই। ১. জাতীয় বাজেটে এবং জলবায়ু তহবিল হতে এ এলাকার জন্য বিশেষ বরাদ্দ রাখা ২. এলাকার ইস্যুগুলোকে নিয়ে বিস্তর গবেষণা পরিচালনা করা ৩. বিপন্ন জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

মোঃ কামরুজ্জামান, টেকনিক্যাল কো-অর্ডিনেটর
প্রডিউস প্রকল্প, কেয়ার বাংলাদেশ

*[বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে ৫ জুন ২০১২ তারিখে রংপুর জেলা পরিষদ ও পরিবেশ অধিদপ্তর আয়োজিত সেমিনারে এই প্রবন্ধটি উপস্থাপিত হয়]*

ইউনিয়ন পরিষদ, সিবিও ও স্বভাবনেতা সংগঠনের সমন্বয় সভার একটি দৃশ্য

প্রকল্পের চলমান কাজসমূহ :

০১. ইউনিয়ন পরিষদের ভিশন প্ল্যান/ দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

০২. ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন কার্যক্রমে দরিদ্র, হতদরিদ্র ও নারীর অংশগ্রহণের কর্মপন্থা ও পদ্ধতি নির্ধারণে কর্মশালা আয়োজন

০৩. স্বভাবনেতা সংগঠনের পরিচিতিমূলক সভা

০৪. ইউনিয়ন পর্যায়ে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন/ Folk drama আয়োজন

০৫. ইউনিয়ন এবং উপজেলা পর্যায়ে স্বভাবনেতা সংগঠন ও কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠনের মাঝে নেটওয়ার্ক এবং অ্যালায়েন্স গঠন ও শক্তিশালীকরণে কর্মশালা আয়োজন

০৬. ইউনিয়ন এবং উপজেলা পর্যায়ে ননস্টেট অ্যাক্টর এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাঝে সমন্বয়কে উৎসাহিত ও শক্তিশালী করার কর্মপন্থা নির্ধারণে কর্মশালা আয়োজন

০৭. ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক উন্মুক্ত বাজেট সভা/ Open budget meeting আয়োজন

০৮. ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক নারীবান্ধব প্রকল্প গ্রহণ (প্রকল্প ম্যাচ গ্র্যান্টের সহায়তায়)

০৯. শিখন সফর/ এক্সপোজার ভিজিট (প্রকল্পভূক্ত এবং প্রকল্প বহির্ভূত ইউপিতে)

১০. ইউনিয়ন পর্যায়ে সেবাপ্রদানকারী সংস্থা, স্বভাবনেতা সংগঠন ও কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠনের মাঝে সভা আয়োজন

ভেলাবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদের উন্মুক্ত বাজেট আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

কেয়ার বাংলাদেশ-এর ইম্প্যাক্ট ডাইরেক্টর-ই.আর.পি.পি. আনোয়ারুল হক সাপ্টীবাড়ি ইউনিয়নের একটি সঞ্চয় দলের সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করছেন

১১. ইউনিয়ন পরিষদ প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে স্থানীয় সম্পদ সমাবেশীকরণ প্রশিক্ষণ আয়োজন

১২. স্থানীয় পর্যায়ে লোকাল গভর্নেন্স প্রশিক্ষণ আয়োজন

১৩. স্থানীয় পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি প্রশিক্ষণ আয়োজন

১৪. ওয়ার্ড/ ইউপি/ উপজেলা পর্যায়ে এনএলও/ সিবিও এবং সমমনা সংগঠন/ শক্তি নিয়ে নেটওয়ার্ক/ অ্যালায়েন্স গঠন

১৫. কমিউনিটির হতদরিদ্র ও দরিদ্র পাড়ায় স্ব-মূল্যায়ন এবং কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।


**উপদেষ্টা পরিষদ:**
সেলিম রেজা হাসান, ডাইরেক্টর, পি.ডি.ইউ, কেয়ার বাংলাদেশ
আনোয়ারুল হক, ডাইরেক্টর ইম্প্যাক্ট-ই.আর.পি.পি. কেয়ার বাংলাদেশ

**সম্পাদক :** আ,ন,ম কায়সার জিলানী, টিম লিডার, স্থানীয় শাসন প্রকল্প, কেয়ার বাংলাদেশ
**সম্পাদনা পরিষদ :** মোঃ সারওয়ার, টি.সি. লার্নিং অ্যান্ড মনিটরিং, গিয়াস উদ্দিন আহমেদ, টি.সি. ট্রেনিং
রোমেনা আক্তার, টি.সি. কমিউনিটি এমপাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি
এসকে. মহব্বত হোসেন, পি.এম. স্যাপ বাংলাদেশ এবং মীর মোঃ আব্দুর রহিম, পি.এম, এসকেএস ফাউন্ডেশন

European Union

SKS

SAP-BD

care

কেয়ার বাংলাদেশ রংপুর রিজিওনাল অফিস থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত

মুদ্রণ : এজ্ কনসাল্টিং, ঢাকা, ০১৭১৩-০১৬৩৯৪, ০১৯১১-৩৫৪০৫০